সালাতের সময়সূচি

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন

অনুবাদ সম্পাদনা : আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2011-1432

﴿ رسالة في مواقيت الصلاة ﴾

« باللغة البنغالية »

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

مراجعة الترجمة: أبو بكر محمد زكريا

2011 - 1432

IslamHouse.com

সালাতের সময়সূচি

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁর নিকট সাহায্য চাই। আমরা তাঁর সমীপে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করি, আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি কুপ্রবৃত্তি ও দুষ্কৃতি থেকে। আল্লাহ যাকে সৎ পথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ সৎ পথে পরিচালিত করতে পারে না।

আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন হক্ক মাবুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আর আল্লাহ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন, তাঁর পরিবার পরিজন, তাঁর সাহাবী ও অনুসারীদের উপর, আর যারা সৎ কাজে তাঁদের অনুসরণ করবে তাঁদের উপর অনুগ্রহ করুন।

অত:পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহদের প্রতি দিনরাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। আল্লাহ তা'আলার মহান হিকমত ও মহিমা মোতাবেক সে সময়গুলো নিরূপিত হয়েছে। যাতে করে বান্দাহ এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নির্ধারিত সময়ে স্বীয় রবের সাথে

সম্পর্ক স্থাপনের নেক নযরে থাকার সুযোগ লাভে সক্ষম হতে পারে। এটা যেন হৃদয়ের জন্য পানি স্বরূপ তরুলতাকে সঞ্জীবিত রাখার জন্য মাঝে মাঝে তাতে পানি সিঞ্চনের প্রয়োজন হয়। এরূপ নয় যে, মাত্র একবার সিঞ্চন করে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। নামাযের সময়কে বিভিন্ন সময়ে নির্ধারিত করায় বান্দাহর উপর তা যেন এক সময়ে আদায়ের কারণে ক্লান্তি ও বোঝা স্বরূপ না হয়। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা বরকতময়, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাময়।

এটা একটা ক্ষুদ্র পুস্তিকা। এতে আমরা নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদসমূহে নামযের সময়সূচি সম্পর্কে আলোচনা করব:

প্রথম পরিচ্ছেদ: নামাযের সময়সূচি বর্ণনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা ওয়াজিব এবং নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা পরে নামায আদায় করার বর্ণনা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: যে কোন নামাযের জন্য নির্ধারিত সময় পাওয়া গেলে উক্ত নামায ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: দুই ওয়াক্তের নামায এক ওয়াক্তে একত্রিত করে পড়ার হুকুম কি? এর বর্ণনা।

অত্র পুস্তিকায় আমরা কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ করেছি এবং মাসআলাগুলোকে প্রমাণসহকারে উল্লেখ করেছি যাতে করে পাঠক দৃঢ়তা, প্রশান্তি ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে।

মহান আল্লাহর দরবারে ঐকান্তিক আশা, তিনি যেন এটা কবুল করেন এবং তা সমস্ত মুসলিমের জন্য বরকতময় ও কল্যাণময় হয়। নিশ্চয়ই তিনি পরম দয়ালু।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সময়সূচির বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন-

﴿وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ٦٤﴾ [النحل:٦٤]

“আমি তোমার নিকট এ কুরআন এ জন্য নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদের নিকট বর্ণনা কর, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য ইহা হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ।” [১৬:৬৪]

তিনি আরো বলেন-

﴿وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ ٨٩﴾ [النحل:٨٩]

“আমি তোমার নিকট কিতাব নাযিল করেছি যে, সমুদয় বিষয়ের বর্ণনাকারী এবং সেটা হেদায়ত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ।” [১৬ : ৮৯]

সুতরাং বান্দারা তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে যে সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে, আল্লাহ তা‘আলা ঐ

সমুদয় বিষয় তাঁর কিতাবে অথবা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীসে সবিস্তারে বর্ণনা করে দিয়েছেন। হাদীস হচ্ছে কুরআনের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সাধারণভাবে বর্ণিত বিষয়কে খাসভাবে চিহ্নিত করেছে এবং ব্যাপকভাবে বর্ণিত বিষয়গুলোকে হাদীস সীমিতভাবে চিহ্নিত করে দেয়। বস্তুত কুরআনের একটি আয়াত অন্যটির জন্য বর্ণনা ও ব্যাখ্যা স্বরূপ এবং স্থানে স্থানে সংক্ষিপ্তকে বিস্তৃত, ব্যাপককে সীমিত, সাধারণভাবে বর্ণিত বিষয়কে বিশেষ ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে।

এ প্রেক্ষাপটেই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন-

জেনে রাখ! আমাকে কুরআন এবং তার অনুরূপ একটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে। [আহমদ: ৪/৩১; আবু দাউদ: ৪০৬৪]

এর সনদ সহীহ। উল্লেখিত কানুনের পরিপ্রেক্ষিতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সূচির বর্ণনা অন্যতম, যে নামাযগুলো শারীরিক আমলের মধ্যে ফরয হিসেবে করা হয়েছে এবং মহামহীম আল্লাহ তা'আলার নিকট অতীব প্রিয়। আল্লাহ তাঁর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীসে সময় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودٗا ٧٨﴾ [الإسراء:٧٨]

"নামায কায়েম কর, সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার আচ্ছন্ন হওয়ার সময় পর্যন্ত, আর ফজরের কুরআন পাঠ (এর সময়); নিশ্চয় ফজরের কুরআন পাঠের সময় ফেরেশতা উপস্থিত থাকে।" (১৭ : ৭৮)

এতে আল্লাহ পাক তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আদেশ করেছেন, আর এ আদেশের অর্থ হলো তাঁর সাথে, তাঁর উম্মতের উপর এ নির্দেশ। সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির নিবিড় অন্ধকার আচ্ছন্ন হওয়ার সময় পর্যন্ত, আর এ অন্ধকার অর্ধরাত্রিতে হয়ে থাকে।

অত:পর পৃথকভাবে বর্ণনা করে বলেন:

﴿ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ ﴾ [الإسراء:٧٨]

"আর ফজরে কুরআন পাঠ কর" এর অর্থ হলো ফজরের নামায। আর ফজরের নামাযকে কুরআন দ্বারা ব্যাখ্যার কারণ হলো এতে কুরআনের পাঠ দীর্ঘায়িত করা হয়।

﴿لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ﴾ [الإسراء:٧٨]

"সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় হতে রাত্রির অন্ধকার আচ্ছন্ন হওয়ার সময় পর্যন্ত" আল্লাহ এ পবিত্র বাণীতে চার ওয়াক্ত

নামাযের সময়সূচি বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হচ্ছে যোহর ও আসরের সালাত, আর উভয় সালাতই দিবসের শেষার্ধের নামায এবং মাগরিব ও ইশার সালাত, যা রাতের প্রথমার্ধের নামায। পক্ষান্তরে "ফজরের নামাযের কুরআন পাঠ" এ পবিত্র কালাম দ্বারা ফজরের সময় পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। "আল-ফজর" শব্দটির দ্বারা নির্ধারিত সময়ের কথা বলা হয়েছে। আর সেটি হলো: পূর্বাকাশে সূর্যের আলোকচ্ছটা প্রকাশিত হওয়ার সময়।

বস্তুত আল্লাহ তা'আলা চারটি সময় একত্রিত করেছেন, কেননা সময়গুলো একটি অপরটির সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। একটি নামাযের সময় শেষ হতে না হতেই অপরটি উপস্থিত হয়। আর ফজরের সময়টি পৃথকভাবে এজন্য বর্ণিত হয়েছে যে, তার সাথে আগে পিছের সময়ের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, ইশার ও ফজরের নামাযের মধ্যে প্রতিবন্ধক হচ্ছে দিনের মধ্যভাগ, যেমন তা হাদীসের আলোকে বর্ণিত হবে ইন্শা আল্লাহ।

পক্ষান্তরে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন- নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন- "যোহর নামাযের ওয়াক্ত তখন শুরু হয় যখন সূর্য ঢলে পড়ে, আর প্রত্যেক মানুষের ছায়া তার সমান দীর্ঘ হওয়া পর্যন্ত আসরের ওয়াক্ত উপস্থিত হয় না। আর আসরের নামাযের সময় সূর্য হলুদ না হওয়া পর্যন্ত, আর মাগরিবের সময় সূর্য অস্ত যাওয়া

থেকে তার লালিমা বাকি থাকা পর্যন্ত এবং ইশার নামাযের সময় থাকে মধ্যরাত পর্যন্ত। আর ফজরের ওয়াক্ত সূবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত। অন্য বর্ণনায় আছে, ইশার নামাযের সময় অর্ধরাত্রি পর্যন্ত। [মুসলিম:২১৬]

সহীহ মুসলিমে আবু মূসা আশ'আরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন-জনৈক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে এসে নামাযের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তার প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। (বর্ণনাকারী) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুবহে সাদিক হওয়ার পর ফজরের নামায আরম্ভ করেন, সে সময় মানুষ একে অপরকে চিনতে পারছিল না। অত:পর তিনি তাকে অর্থাৎ বিলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে -যেমন নাসায়ী শরীফের বর্ণনায় আছে- আদেশ দিলেন, অত:পর তিনি কায়েম করেন যোহরের নামায, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যোহরের নামায আরম্ভ করেন সূর্য ঢলে পড়ার পর ঐ সময়ে, কোন কোন লোক বলছিল যে, "দিনের মধ্যাহ্ন সময় হয়েছে" অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের মাঝে নামাযের সময় সম্পর্কে অধিক অবহিত। তিনি আবার বেলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)কে আদেশ দেন, অত:পর তিনি কায়েম করেন আসরের নামায, আর সূর্য তখন বেশ উঁচুতে ছিল। অত:পর তিনি বেলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে মাগরিবের নামায কায়েম করার আদেশ দেন যখন সূর্য অস্ত যায়। - নাসায়ী শরীফের এক বর্ণনায়

“ওকা‘আত” এর স্থলে “গারাবাত” আছে তবে অর্থ একই।- পরে তিনি পশ্চিমাকাশের লালিমা মিটে যাওয়ার পর বেলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে ইশার নামাযের ইকামাত দেয়ার আদেশ দেন। দ্বিতীয় দিন তিনি ফজরের নামায এতটা দেরী করে আদায় করেন যে, নামায শেষে কোন ব্যক্তি বলছিল যে, সূর্য উদিত হয়ে গেছে অথবা উদিত হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছে। বিগত দিনের প্রায় আসরের সময় পর্যন্ত দেরী করে যোহর আদায় করেন। আবার আসরের নামায এতটা দেরী করে আদায় করেন যে, নামায শেষে একজন বলে উঠে যে, সূর্য লার বর্ণের হয়ে গেছে। মাগরিবের নামায এতটা দেরী করে আদায় করেন যে, পশ্চিমাকাশের রঙিন আভা প্রায় মিটে যায়। অতঃপর সকাল হলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রশ্নকারীকে ডেকে বলেন, “নামাযের সময় হলো-এ দু’সময়ের মধ্যবর্তী সময়।” [মুসলিম:৩২৫]

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় কুরআন মজীদের আয়াত ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীস দ্বারা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

১- যোহরের নামাযের সময় শুরু হয় সূর্য ঢলে পড়লে, অর্থাৎ আকাশের মাঝ দিয়ে পার হওয়ার পর, তা ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ না প্রতিটি বস্তুর ছায়া সে বস্তুটির অনুরূপ না হয়। তবে যে ছায়াটি পড়ার পর সূর্য ঢলে যায় তা থেকে তার শুরু কার্যকর হয়।

এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, সূর্য যখন উদিত হয়, তখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া অতি লম্বা দেখায়, অত:পর ক্রমান্বয়ে ছায়াটি ছোট হতে থাকে যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ে; তারপর যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে আবার ছায়াটি লম্বা হতে আরম্ভ করে, আর তখনই যোহরের সালাতের সময় প্রবেশ করে। সুতরাং যখন থেকে ছায়া আবার লম্বা হতে শুরু করে তখন থেকে নির্ধারণ করতে হবে, অতঃপর যখন কোন বস্তুর ছায়া সেটার অনুপাত হবে তখনই যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে।

২- আসরের নামাযের সময় হলো প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমান হওয়া থেকে শুরু করে সূর্য হলুদ বর্ণ বা লাল বর্ণ হওয়া পর্যন্ত।

আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে আসরের সময় সূর্যাস্ত পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে; নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের এক রাকাআত সূর্যোদয়ের পূর্বে পেয়েছে, সে যেন ফজরের নামায পেয়েছে এবং যে ব্যক্তি আসরের নামাযের এক রাকাআত সূর্যাস্তের পূর্বে পেয়েছে সে যেন আসরের নামায পেয়েছে। [বুখারী: ৯৭৫ ; মুসলিম: ৮০৬]

৩. মাগরিবের নামাযের সময় হলো সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশে লালিমা অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত|

৪. ইশার নামাযের সময় লালিমা মিটে যাওয়ার পর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত, সুবহে সাদিক পর্যন্ত নয়। কেননা, এটা কুরআন ও

হাদীসের বিরোধী। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন। "নামায কায়েম করো সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়া থেকে রাত্রির অন্ধকার আচ্ছন্ন হওয়া পর্যন্ত।" আর একথা বলেন নি যে ফজর পর্যন্ত। হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ইশার নামায মধ্যরাত পর্যন্ত, যেমনভাবে আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

৫. ফজরের নামাযের সময় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। আর সুবহে সাদিক হলো- পূর্বাকাশের ঐ লম্বা সাদা রেখা, যার পরে আর কোন অন্ধকার থাকে না। এ হচ্ছে নির্ধারিত সময়সূচি।

"এই নির্ধারিত সময়গুলো ঐ সকল স্থানের জন্য প্রযোজ্য যেখানে চব্বিশ ঘন্টা দিন-রাত হয় চাই রাত-দিন সমান হোক অথবা কমবেশী হোক।

কিন্তু যে সকল স্থানে চব্বিশ ঘন্টায় রাত-দিন আসে না, সেসব স্থানের দুটি অবস্থা হয়; এক. সে অবস্থাটি সারা বছর বিরাজমান থাকবে অথবা বছরের কিছু অংশে থাকবে। যদি বছরের কিছু অংশ এ রূপ হয়, যেমন এ সকল স্থানে বছরের বিভিন্ন ঋতুতে রাত-দিনের স্থিতিকাল চব্বিশ ঘন্টা, কিন্তু কোন কোন ঋতুতে সেখানে রাতের স্থিতিকাল চব্বিশ ঘন্টা কিংবা ততোধিক এবং দিনের অবস্থাও অনুরূপ হয়। তাহলে এমতাবস্থায় চব্বিশ ঘন্টা দিন কিংবা রাত্রি শুরু হওয়ার আগের দিন অনুসারে সালাতের সময় নির্ধারিত হবে। যেমন যদি ধরে নেই যে, চব্বিশ ঘন্টা রাত-

দিন শুরু হওয়ার আগে রাত ছিল বিশ ঘন্টা আর দিন ছিল চার ঘন্টা, এমতাবস্থায় চব্বিশ ঘন্টা রাত-দিন শুরু হওয়ার পর বিশ ঘন্টা হবে দিন, আর চার ঘন্টা হবে রাত। আর সেটা অনুসারে সকল নামাযের সময় আগের মতই নির্ধারণ করে নেব।

আর যদি সে সকল স্থানে এমন হয় যেখানে বছরের সব ঋতুতেই রাত দিনের স্থিতিকাল চব্বিশ ঘন্টা হয় তাহলে সময় অনুপাতে নামাযের ওয়াক্ত স্থির করতে হবে। এ প্রসঙ্গে সহীহ মুসলিমে একখানি হাদীস রয়েছে নাওয়াস বিন সাম‘আন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত-দাজ্জাল পৃথিবীতে কত দিন অবস্থান করবে সাহাবীগণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন চল্লিশ দিন। প্রথম দিনটি হবে এক বছরের সমান। দ্বিতীয় দিনটি হবে এক মাসের সমান। তৃতীয় দিনটি হবে এক সপ্তাহের সমান। আর বাকী দিনগুলো হবে তোমাদের এদিনগুলোর মত। তখন তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহর রাসূল ! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে ওতে একদিনের নামায পড়া কি আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন- না! এদিনটিকে সাধারণ দিনের সমান অনুমান করে নিও।”

যখন একথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, যে স্থানে দিন রাতের আগমন নির্গমন হয় না সেখানে অনুমান করে সময় নির্ধারণ করতে হবে। তাহলে কিভাবে নির্ধারিত করতে হবে?

কতিপয় আলিমের অভিমত হলো: সেটি স্বাভাবিক সময় দিয়ে নির্ধারণ করতে হবে। বার ঘন্টায় রাত ধরতে হবে। তেমনিভাবে দিনও। কারণ সময় নির্ধারনের ক্ষেত্রে যখন খোদ সেই স্থানটিকে ধরা যাচ্ছে না তখন ঐ স্থানের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক স্থানগুলোর উপর কিয়াস করতে হবে। যেমন মুসতাহাযা মহিলা (রক্তপ্রদর রোগিনী) যার স্বাভাবিক ও নির্দিষ্টভাবে রক্তস্রাব হয় না[1]।

অপরদিকে কতিপয় আলিম বলেন, ঐ স্থানে নিকটতম দেশের সময় অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে; কারণ যখন স্বয়ং সেই স্থানটিকে মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করা কষ্টকর তখন তার সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থানকে মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আর সেটি হলো সেই স্থানের নিকটতম দেশ যেখানে চব্বিশ ঘন্টায় রাত দিন হয়। এই উক্তিটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কারণ এটি যুক্তির নিরিখে বলিষ্ঠতর এবং বাস্তবতার নিকটতর। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।”

---

[1] কারণ, রক্তপ্রদর রোগিনী যদি তার হায়েয ও রক্তপ্রদরের মধ্যে পার্থক্য করতে না পরে, তবে তার হায়েয এর সময় তার সমবয়সী ও সম সমস্যাগ্রস্থ বা তার পূর্বের আসল অভ্যাসমত অথবা ছয় কিংবা সাত দিন নির্ধারণ করতে হয়। [সম্পাদক]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নির্ধারিত সময়ে নামাযের কার্যাবলী সম্পাদন করা উহা সময়ের অগ্রপশ্চাতে করার হুকুম

সকল নামায তার নির্ধারিত সময়ে আদায় করা ওয়াজিব; আল্লাহ তা'আলার নির্দেশানুসারে। তিনি বলেন,

"নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা মুমিনের উপর ফরয করা হয়েছে।" [৪:১০৩]

আল্লাহ তা'আলার এ কথাও এর সাক্ষ্য বহন করে-

"নামায কায়েম করো পশ্চিমে সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার আচ্ছন্ন হওয়া পর্যন্ত, আর ফজরের সময় কুরআন পাঠ করো, কেননা, ফজরের কুরআন পাঠের সময় ফেরেশতা উপস্থিত থাকেন।"

আর এখানে যে নির্দেশ এসেছে তা ওয়াজিব বা অবশ্যম্ভাবী বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত- নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন নামাযের আলোচনা করেন, অত:পর ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি নামাযের সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে যথা সময়ে নামায আদায় করবে, তার জন্য রয়েছে একটি জ্যোতি, দলিল

(প্রমাণ এবং কিয়ামতের দিনে ভয়াবহ শাস্তি থেকে পরিত্রাণ। আর যে ব্যক্তি নামাযের সময়ের হেফাজত করবে না, তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ থাকবে না এবং কিয়ামত দিবসে সে পরিত্রাণও পাবে না। কিয়ামতের দিবসে তার হাশর হবে অভিশপ্ত কারূন, ফির'আউন, হামান, উবাই ইব্‌ন খালফ এর সাথে। (আহমদ: ২/১৬৯) ইমাম মুনযিরী বলেন, হাদীসটি ইমাম আহমাদ জইয়েদ বা উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।

নির্ধারিত সময়ের কিছূ পূর্বে বা সম্পূর্ণ পূর্বে নামায আদায় করা কোন মুসলিমের উচিত হবে না। কেননা তা আল্লাহর সীমা লংঘন ও তাঁর আয়াতসমূহকে উপহাস করার শামিল। হ্যাঁ, যদি অজানাবস্থায় বা ভুলবশত: অথবা অসতর্ক অবস্থায় কেউ এরূপ করে তাতে কোন পাপ নেই। সে তার কাজের সওয়াব পাবে। তবে সময় আসা মাত্র নামায আদায় করা তার জন্য ওয়াজিব হবে। কেননা, নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কাজেই যখন সে সময় আসার পূর্বেই নামায আদায় করেছে, তার নামায হয়নি এবং সে তার দায়িত্ব থেকেও মুক্তি পায় নি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীসানুসারে ইমাম মুসলিম আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেন- "যে ব্যক্তি এমন আমল করল যে সম্পর্কে শরীয়তে কোন নির্দেশ নেই, তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত হবে।[2]"

---

[2] মুসলিম, সহীহ, হাদীস নং ১৭১৮।

অনুরূপভাবে কোন মুসলিমের এটা উচিত নয় যে, সে নির্ধারিত সময়ের পরে নামায আদায় করে, কেননা, তা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের সীমালংঘন ও তাঁর আয়াতের প্রতি বিদ্রুপের শামিল। কেউ যদি বিনা ওজরে এরূপ করে তবে সে গুনাহগার হবে। এতে তার নামায কবুল হয় না, বরং প্রত্যাখ্যাত হয়। উল্লেখিত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদীসানুসারে সে তার দায়িত্ব হতে মুক্ত হতে পারে না। তার উপর ওয়াজিব সে যেন আল্লাহর নিকট অনুতপ্ত হয়, আর অবশিষ্ট জীবন সৎ কাজে ব্যয় করে।

আর সে যদি কোন ওযরের কারণে যথা সময়ে নামায আদায় করতে দেরী করে, যেমন ঘুমিয়ে যাওয়া বা ভুলে যাওয়া অথবা কোন ব্যস্ততার কারণে এ ধারণা করে যে, নামায তার নির্দিষ্ট সময় হতে দেরীতে আদায় করা জায়েয, এমতাবস্থায় যখনই এমন ওযর দূর হবে তখনই সে তা আদায় করে নিবে। আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসানুসারে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি নামায আদায় করার কথা ভুলে যায়, সে তখনই আদায় করবে, যখন তার স্মরণে আসে। ঐ নামায আদায় করা ছাড়া আর কোন কাফ্ফারা নেই।"

অন্য বর্ণনায় আছে "যে নামাযের কথা ভুলে যায় অথবা নামায রেখে ঘুমিয়ে যায়"। (বুখারী ও মুসলিম)

আর যদি কোন ওজরে কয়েক ওয়াক্তের নামায কাযা হয়ে যায়, তবে ওযর দূর হলে সে আগের নামায আগে তবে ওযর দূর হলে

সে আগের নামায আগে এবং পিছের নামায পিছে এমনিভাবে আদায় করে নেবে। সে যেন এজন্য বিলম্ব না করে। সে প্রত্যেক নামায তার ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করবে। জাবের ইব্‌নে আব্দুল্লাহর হাদীস প্রমাণ করে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খন্দকের যুদ্ধে সূর্যাস্তের পর ওযু করে আসরের নামায আদায় করেন। অত:পর মাগরিবের নামায আদায় করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

তাছাড়া আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে উহা বর্ণিত আছে তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে মাগরিবের পরও কিছু রাত পর্যন্ত আমাদের নামায আদায় করার সুযোগ হয় নি। বর্ণনাকারী বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)কে ডাক দিয়ে ইকামাত দিতে বলেন, অত:পর সে যোহরের ইকামাত দিলে তিনি অতি উত্তমরূপে তা আদায় করেন।

তারপর আসরের ইকামাত দেয়ার আদেশ দেন, অত:পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অতি উত্তমরূপে আসরের নামায আদায় করেন যেমনভাবে আসরের ওয়াক্তে আদায় করতেন। আবার তাকে মাগরিবের নামাযের ইকামাত দিতে বলা হয়, এভাবে তিনি মাগারিবের নামায আদায় করেন। (আহমাদ)

কাযা নামায এভাবে আদায় করবে যেভাবে তা ওয়াক্তে আদায় করা হয়। উক্ত হাদীসেই এ কথার প্রমাণ করে। আর আবু কাতাদাহর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হাদীস থেকে জানা যায়, সফরে

একবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সঙ্গে তারা ফজরের নামায রেখে সুর্যোদয় পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলেন। আবু কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন- বেলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নামাযের আযান দেন, অত:পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু' রাক'আত সুন্নাত নামায আদায় করেন, তারপর ফজরের নামায আদায় করেন, এরূপে যেমনভাবে প্রতিদিন করে থাকেন। (মুসলিম) একথার উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে যে, রাতের ছুটে যাওয়া (জেহরী নামায দিনে আদায় করলে নামাযের কিরাত স্বশব্দে পড়তে হবে। আর দিনের ছুটে যাওয়া নামায রাতে আদায় করা হলে নামাযের কিরাত মনে মনে পড়তে হবে।

প্রথমটির প্রমাণ হলো আবু কাতাদার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হাদীস। আর দ্বিতীয়টির প্রমাণ হলো আবু সাঈদ খুদরীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হাদীস। কোন কারণবশত: কাযা নামায পরস্পর না হলে কোন অসুবিধা হবে না। তার উপর যে কাযা নামায আছে সে কথা ভুলে পরবর্তী নামায আগে পড়ে ফেলে, তারপর স্মরণ হলে সে উক্ত নামায কাযা পড়বে, আর এজন্য পেছনের নামাযটি দ্বিতীয়বার পড়তে হবে না। এর দলীল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী:

“হে আমাদের রব ! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা দোষ করে ফেলি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না।” (২:২৮৬)

আমাদের অভিমত: যখন কোন ব্যক্তির স্মরণ হবে যে, তার কাযা নামায আছে, আর উপস্থিত নামাযের সময়ও শেষ প্রায়, এমতাবস্থায় তিনি বর্তমানের নিয়তে বর্তমানের নামায আদায় করবেন। তারপর কাযা নামায আদায় করবেন। কেননা, বর্তমানের নামায সমায় যাওয়ার আগে আদায় না করলে দু' নামাযই কাযা হয়ে যাবে।

আর সর্বাপেক্ষা উত্তম পন্থা হলো প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করা, কেননা, এটাই ছিল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নীতি। তিনি দায়িত্ব প্রতিপালনের মাধ্যমে দায়িত্বমুক্ত হওয়া এবং কল্যাণের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রতি সবচেয়ে বেশী অগ্রণী।

সহীহ বুখারীতে আবু বারযাহ আসলামী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত আছে যে, জিজ্ঞেস করা হলো যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরয নামায কোন সময়ে আদায় করতেন? তিনি বললেন: যোহর যাকে তোমরা প্রথম নামায বলো- সূর্য যখন পশ্চিমে ঢলে পড়তো। আর আসর পড়তেন তারপর আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে তার বাড়ীতে ফিরে অথচ তখনও সূর্যের তাপ প্রখর থাকতো।

সহীহ বুখারীতে আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও একটি বর্ণনা আছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন সময় আসরের নামায পড়তেন যখন সূর্য উচ্চ ও উজ্জ্বল থাকতো। অত:পর কেউ আওয়ালীর (উঁচু আবাসভূমি) দিকে যেত এবং তথায় পৌঁছার

পরও সূর্য উপরে থাকতো, অথচ আওয়ালীর কোন কোন অংশ মদীনা হতে চার মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। অন্য বর্ণনায় আছে, আমরা আসর নামায আদায় করতাম, অত:পর আমাদের কেউ কোবার দিকে গিয়ে সেখান থেকে আবার ফিরে আসতাম, তখনও সূর্য উপরে থাকতো। বর্ণনাকারী বলেন, মাগরিব সম্পর্কে তিনি কি বলেছেন তা আমি ভূলে গেছি।

কিন্তু এ সম্পর্কে ইমাম মুসলিম সালামা ইব্ন আকওয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে মাগরিবের নামায আদায় করতাম, অত:পর আমাদের কেউ নামায শেষে) ফিরতো, আর তখন সে তার তীর পড়ার স্থান দেখতে পেতো। আর ঈশা যাকে তোমরা 'আতামা' বলে থাকো, তা তিনি দেরী করে আদায় করতে ভালবাসতেন এবং এর পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং পরে কথা বলা অপছন্দ করতেন। তিনি ফজরের নামায হতে এমন সময় অবসর গ্রহণ করতেন, যখন কেউ কাছে ঘেষে বসা ব্যক্তিকে চিনতে পারতো না এবং এতে ষাট হতে একশ আয়াত পর্যন্ত পড়তেন।

বুখারী ও মুসলিমে জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈশার নামায কখনও কখনও (বেশী রাত না করে) তাড়াতাড়ি আদায় করতেন, যখন দেখতেন লোকজন সব এসে গেছে। আবার বিলম্বেও আদায়

করতেন যখন দেখতেন সব লোক এখনও এসে উপস্থিত হয় নাই। আর ফজর আদায় করতেন অন্ধকার থাকাবস্থায়।

সহীহ বুখারীতে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, মুসলিম নারীগণ নিজেদের চাঁদর মুড়ি দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে ফজর নামাযের জামায়াতে উপস্থিত হতেন। অত:পর তারা নামায আদায় করে নিজেদের ঘরে ফিরে যেতেন অথচ অন্ধকার হেতু তাদের চেনা যেত না।

সহীহ মুসলিমে ইব্‌নে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: আমরা এক রাতে ঈশার নামাযের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অপেক্ষা করতেছিলাম। অত:পর তিনি বেরিয়ে আসলেন যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল অথবা এর কিছু পর। (আমরা জানিনা কোন কাজ তাকে আবদ্ধ রেখেছিল, তার পরিবার বা এছাড়া অন্য কিছু।) যখন তিনি বেরিয়ে আসলেন তখন তিনি বললেন: তোমরা এমন একটি নামাযের জন্য প্রতীক্ষা করছ, যার জন্য অপর কোন ধর্মাবলম্বীরা প্রতীক্ষা করে না। যদি আমি আমার উম্মতের পক্ষে বোঝা হবে একথা মনে না করতাম, তাহলে তাদের নিয়ে এ নামায আমি এ সময়েই পড়তাম। অত:পর তিনি মুয়াজ্জিনকে নির্দেশ দেন, তিনি ইকামত দিলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামায পড়ান।

সহীহ বুখারীতে আবু যর গিফারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: আমরা এক সফরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে ছিলাম মুয়াজ্জিন যোহরের আযান দেয়ার ইচ্ছা করলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: কিছু সময় ঠান্ডা হতে দাও। মুয়াজ্জিন আবার আযান দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে তিনি বলেন: আরো কিছু সময় ঠান্ডা হতে দাও। এমনকি আমরা 'ফাইয়ে তালুল' বা টিলাসমূহের ছায়া দেখতে পেলাম। অর্থাৎ আমরা যাকে বস্তুর ছায়া বলি তা দেখলাম। অত:পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: উত্তাপের আধিক্য দোযখের তাপ থেকে, কাজেই যখন উত্তাপ বাড়বে তখন তা শীতল হওয়ার পর নামায আদায় করবে।

উল্লেখিত হাদীসে জানা যায় যে, দুই ওয়াক্তের নামায ব্যতীত অন্যান্য নামায প্রথম ওয়াক্তে পড়ার জন্য তাড়াতাড়ি করা সুন্নাত:

প্রতমত: উত্তাপের আধিক্য হলে যোহরের নামাযের জন্য এতটা দেরী করতে হবে, যাতে উত্তাপ কিছুটা ঠাণ্ডা হয় এবং বস্তুর ছায়াও দীর্ঘ হয়।

দ্বিতীয়ত: ঈশার নামায রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করা যায়, তবে এ ব্যাপারে মুসল্লিগণ সকলে যখন উপস্থিত হবে, তখন তাড়াতাড়ি নামায আদায় করতে হবে। আর যখন দেখা যাবে সকলে আসেন নি তখন দেরী করা যাবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কতটুকু সময় পেলে নমাযের ওয়াক্ত পাওয়া যায় সে সম্পর্কে

এক রাকাআত নামায আদায় করার মত সময় পাওয়া গেলে ঐ ওয়াক্তটা পাওয়া গেছে বলে মনে করতে হবে। অর্থাৎ যদি কেউ নামাযের শেষ ওয়াক্তে এক রাকাআত নামায আদায় করার মত সময় পায়, তবে সে যেন ঐ নামাযের পূর্ণ ওয়াক্তটা পেয়ে গেল। তার প্রমাণ হচ্ছে আবু হুরাইরা রা) এর হাদীস নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকা‘আত পেল সে যেন পূর্ণ নামায পেল।” (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি ফজরের নমাযের এক রাকাআত সূর্যোদয়ের পূর্বে পেল, সে যেন আসরের পূর্ণ নামায পেল। বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে, যখন তোমাদের কেউ আসরের নমাযের এক সিজদা (রাকাআত) সূর্যাস্তের পূর্বে করে ফেলে, সে যেন তার নামাযকে পূর্ণ করে দেয়। এরূপ যখন সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের একটি সিজদা (রাকাআত) পায়, সে যেন তার নামাযকে পূর্ণ করে নেয়।

উল্লেখিত বর্ণনা এটার প্রমাণ করে দেয় যে, যদি শেষ ওয়াক্তের পূর্ণ রাকআত পায়, তাহলে সে যেন পূর্ণ ওয়াক্তটা পেল। আর এও

প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি শেষ ওয়াক্তে এক রাকাআতের কম সময় পেল সে ঐ ওয়াক্ত পেল না।

সময় প্রাসঙ্গিক আলোচনা দু'টি:

১. মোট কথা যে ব্যক্তি ওয়াক্তের মধ্যে এক রাকআত নামায পায়, তখন তার পূর্ণ নমায আদায় হয়ে যায়। কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে, কিছু নামায তার জন্য ওয়াক্তের পরে পড়া জায়েয হবে, কেননা, পূর্ণ নামাযটা তাকে ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করতে হবে, ওয়াক্তের বাইরে নয়।

সহীহ মুসলিমে আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, এটা মুনাফেকের নামায যে বসে বসে সূর্যের অপেক্ষা করে, যতক্ষণ না সূর্য হলুদ বর্ণের হয় এবং শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যখানে আসে; তখন সে উঠে তাড়াহুড়া করে চারটি ঠোকর মারে, এতে সে আল্লাহকে খুব কমই স্বরণ করে।

২. এক রাকাআত নামায পড়ার সমান সময় পেলে তার উপর নামায আদায় করা ওযাজিব হবে এতে প্রথম ওয়াক্তেই হোক অথবা শেষ ওয়াক্তেই হোক।

প্রথম ওয়াক্তের উদাহরণ: সূর্যাস্তের পর এক রাকাআত কিংবা তার বেশী পরিমাণ নামাযের সময় অতিক্রান্ত হয়েছে এমতাবস্থায়

কোন মহিলা ঋতুবর্তী হলে তার উপর মাগরিবের নামায ওয়াজিব হবে যদি সে নামায না পড়ে থাকে। যখন সে ঋতু থেকে পবিত্র হবে তখন তার উপর মাগরিবের উক্ত নমায কাযা করা ওয়াজিব হবে।

শেষ ওয়াক্তের উদাহরণ: সূর্যোদয়ের পূর্বে এক রাকআত কিংবা তার বেশী পরিমান নামাযের সময় থাকাকালে কোন ঋতুবর্তী মহিলা পবিত্র হলে তার উপর ফজরের নামায আদায় করা ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে সূর্যাস্তের পর এক রাকআত নামায আদায় করার কম সময় থাকাকালে কোন মহিলা ঋতুবর্তী হলে অথবা সূর্যোদয়ের পূর্বে এক রাকাআত নামায আদায় করার কম সময় থাকতে মাগরিবের নামায পড়তে হবে না, কেননা, উভয় মাসয়ালায় প্রাপ্ত সময় এক রাকাআত নমায আদায় করার সময়ের চেয়েও কম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দুই নামাযকে কোন ওয়াক্তে একত্রিত করার হুকুম

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রত্যেক নামাযের কার্যাবলী নির্ধারিত সময়ে আদায় করা ওয়াজিব। আর এটাই হলো মৌলিক বিষয় কিন্তু বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দুই ওয়াক্তের নমায একত্রিত করে পড়ার প্রয়োজন দেখা দিলে তারও অনুমতি রয়েছে। বরং এরও আদেশ দেয়া হয়েছে, আর এটাই আল্লাহ তা'আলার নিকট অতিপ্রিয় যা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অনুকুল। আল্লাহ তাঁর কালামের মাধ্যমে এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন:

"আল্লাহ তোমাদের কাজ সহজ করে দিতে চান, কোনরূপ কঠোরতা আরোপ বা কঠিন করে ভার দেয়া আল্লাহর ইচ্ছা নয়"। [২-১৮৫]

তিনি আরো বলেন:

"তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। [২২-৭৮]

এ সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে একটি বর্ণনা আছে- নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

ইরশাদ করেন, “নিশ্চয়ই দ্বীন তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সহজ। যে ব্যক্তি তাকে কঠোর করবে, তা তার পক্ষে কঠোর হয়ে পড়বে। সুতরাং তোমরা কঠোরতা ত্যাগ করে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে এবং পরিমিতভাবে কাজ করবে, কল্যাণের সুসংবাদ দিবে।”

বুখারী ও মুসলিমে আবু মূসা আল-আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু মূসা এবং মু‘আযকে ইয়ামান প্রদেশে প্রেরনের সময় উপদেশ দান করেন- “তোমরা লোকদের জন্য সহজসাধ্য কাজের নির্দেশ করবে; কষ্টদায়ক কাজের নির্দেশ করবে না; সুসংবাদ দিবে, নৈরাশ্যজনক কথা বলে ভীতশ্রদ্ধ করবে না বরং ঐক্য সহকারে কাজ করবে; মতানৈক্য সৃষ্টি করবে না।”

সহীহ মুসলিমের অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে আবু মূসা থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কোন সাহাবীকে কোন কাজে প্রেরণ করলে উপদেশ দিতেন, সুসংবাদ দিবে, নৈরাশ্যজনক কথা বলে ভীতশ্রদ্ধা করবে না, তোমরা লোকদের জন্য সহজসাধ্য কাজের নির্দেশ করবে, কষ্টদায়ক কাজের নির্দেশ করবেনা।” তাছাড়া বুখারী ও মুসলিমে আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

এটা স্পষ্ট করার পর আমাদের জানা দরকার যে, বিভিন্ন হাদীসে পরিষ্কারভাবে কয়েকটি স্থানে যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও

ইশার দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে, সে স্থানগুলো হচ্ছে,

১. সফরে: কোথায়ও যাতায়াতকালে অথবা অবস্থান কালে উভয়াবস্থায় দু'ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া যায়।

সহীহ বুখারীতে আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পথ চলা অবস্থায় মাগরিব ও ঈশার নামায একত্রে পড়তেন।

সহীহ মুসলিমেও আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে- তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সফরে দু'নামায একত্রে পড়ার ইচ্ছা পোষণ করলে যোহরকে আসরের প্রথম ওয়াক্ত পর্যন্ত দেরী করতেন। অত:পর উভয় নামায একত্রে পড়তেন।

সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে- নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাবুক যুদ্ধের সফরে দু' নামায একত্রে পড়েছেন।

সহীহ মুসলিমে মু'আয ইব্ন জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে- তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সঙ্গে তাবুক যুদ্ধে রওয়ানা হয়েছিলাম। তিনি যোহর এবং আসর, একত্রে আদায় করেন এবং মাগরিব ও ঈশা একত্রে পড়েন।

সহীহ বুখারীতে আছে-আবু হুযাইফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আগমন করেন তখন তিনি দুপুরের সময় অর্থাৎ যোহরের সময় মক্কা শরীফের আবতাহ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন: বেলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বের হয়ে নামাযের আজান দেন ও পরে ভিতরে প্রবেশ করে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওযূর অবশিষ্ট পানি নিয়ে আগমন করলে সাহাবীগণ ঐ পানি গ্রহণের জন্য ভীড় জমায়। আবার প্রবেশ করে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর লাঠি বের করেন। অতপর তিনি চামড়ার বানানো তাঁবু থেকে বের হন। বর্ণনাকারী বলেন: আমি যেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পায়ের ছোট গিরার উপরে শুভ্র অংশটা দেখতে পাচ্ছি। তিনি তাঁর লাঠিটা মাটিতে পুঁতে দিলেন। অত:পর যোহর ও আসর দুই দুই রাকাআত করে নামায আদায় করেন।

এ সকল হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সফরের মধ্যে অবস্থানকালীন অবস্থায় দু নামায একত্রে আদায় করেছেন। একত্রে নামায পড়ার অনুমতি রয়েছে এটা জানানোর জন্য এরূপ করা প্রয়োজন ছিল। আর এটা সত্য যে, হজ্জের সময় মিনায় অবস্থানকালে দু' নামায একত্রে পড়েন নি! এ কথার উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে, অবস্থানকারী মুসাফিরের জন্য দু নামায একত্রে না পড়াটাই উত্তম হবে, আর যদি একত্রে পড়ে তবে কোন গুনাহ হবে না। হ্যাঁ

একত্রে নামায পড়ার প্রয়োজন পড়তে পারে, ক্লান্তির পর বিশ্রামের জন্য অথবা প্রতি ওয়াক্তে পানির সন্ধান করা কঠিন মনে করে, ঐসব কারণে অব্যাহতির সুযোগ গ্রহণ করে দু'নামায একত্রে পড়াই উত্তম হবে।

আর ভ্রাম্যমান মুসাফিরের জন্য যোহর, আসর এবং মাগরিব ও ঈশা সহজ পন্থা অবলম্বনে একত্রে পড়াটাই উত্তম। "জমা তাকদীম" (অগ্রিম একত্রীকরণ) যে দ্বিতীয় ওয়াক্তের নামাযটা প্রথম ওয়াক্তের আদায় করে অথবা "জমা তা'খীর" (পরবর্তীতে একত্রীকরণ) প্রথম ওয়াক্তের নামাযটা দ্বিতীয় ওয়াক্তে আদায় করা।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূর্য পশ্চিম আকাশ ঢলে পড়ার পূর্বেই যদি প্রস্থান করতেন তবে যোহরকে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত পিছিয়ে দিতেন অত:পর অবতরণ করে দু'নামায একত্রে আদায় করতেন। আর মনযিল ত্যাগের পূর্বেই যদি সূর্য ঢলে যেত তখন তিনি যোহরের নামায পড়ে আরোহন করতেন।

২. প্রয়োজনের খাতিরে দু'ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়ার অনুমতি পরিত্যাগ করা উচিত নয়, চাই যে কোন অবস্থায়ই হোক, গৃহে অবস্থানকালে অথবা সফরে। কেননা, সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে-নবী (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনা অবস্থানকালে যোহর ও আসর একত্রে এবং মাগরিব ও ঈশার নামায একত্রে আদায় করেছেন। সেখানে না ছিল কোন ভয় এবং না ছিল বৃষ্টিপাত। বলা হলো এরূপ কেন করলেন? তিনি বললেন যাতে উম্মতের অসুবিধা না হয়।

মু'আয ইব্ন জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে-তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাবুকের যুদ্ধে যোহর ও আসর একত্রে এবং মাগরিব ও ঈশার নামায একত্রে আদায় করেছেন। জিজ্ঞেস করা হলো এরূপ করতে তাঁকে কিসে উদ্বুদ্ধ করলো? তিনি বললেন: তাঁর ইচ্ছা যাতে তাঁর উম্মতের অসুবিধা না হয়। উক্ত হাদীস দু'টিতে এটাই প্রমাণ করে যে, যখনই দু' ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়ার প্রয়োজন হবে, আর তখন তার অনুমতি রয়েছে, সেটা গৃহে অবস্থানকালে হোক অথবা সফরে।

শাইখুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়া (র) বলেন, এ সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, উম্মতের অসুবিধা দূর করার জন্য দু'নামায একত্রে পড়ার অনুমতি রয়েছে। আর একথাও প্রমাণ করে যে, যে রোগের কারণে রোগীর উপর পৃথকভাবে তথা ওয়াক্তে ওয়াক্তে নামায পড়ার অসুবিধা হয়। সে উত্তমভাবেই কয়েক ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়তে পারে।

মুস্তাহাযা (সর্বদা রক্তপ্রদর) ও অন্যান্য অসুখের কারণে প্রত্যেক ওয়াক্তের পুন: পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না এমন রোগীর দু'ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করতে পারে।

"আল-ইনসাফ' নামক পুস্তকে শাইখুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়ার একটি ফাতওয়া পাওয়া যায় যে, যদি নামায তার নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করলে জামায়াত হয় না, এমতাবস্থায় উভয় নামায একত্রে আদায় করা যায়। এর দলীল ইব্ন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস, যাতে বৃষ্টির কারণ উভয় নামায একত্রে আদায় করার অনুমতি আছে এটা একমাত্র জামায়াতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে ছিল। কেননা, প্রত্যেকেরই এটা নামাযের ওয়াক্তে একাকী পড়ে নেয়া সম্ভব ছিল। আর জামায়াত ছাড়াই বৃষ্টি থেকে বেঁচে যেত।

৩. হজ্বের দিনগুলোতে আরাফা ও মুজদালিফায় দু'নামায একত্রে আদায় করার বিধান:

সহীহ মুসলিমে জাবের ইব্ন আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে- নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হজ্জের বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি আরাফাতে আগমন করলে তাঁর অনুমতিতে তাঁর জন্য একটি চামড়ার তাঁবু বানিয়ে দেয়া হয় সেখানে তিনি সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত অবস্থান করেন।

অতপর পথ চলার জন্য উটের লাগাম প্রস্তুত করার আদেশ দেন। তারপর তিনি সে মনযিল ত্যাগ করে "বাতনে ওয়াদী" নামক

স্থানে উপস্থিত জনতার সামনে খুৎবা দেন। বর্ণনাকারী বলেন- সেখানে আযান দেয়া হলে ইকামাত দেয়ার পর যোহরের নামায আদায় করেন। অত:পর দ্বিতীয়বার ইকামাত দেয়া হলে আসরের নামায আদায় করেন। আর উভয় নামাযের মধ্যে অন্য কোন নামায আদায় করেন নি।

আর সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উসামা ইব্ন যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে- তিনি আরাফা থেকে মুযদালিফায়ে গমনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পিছনে একই যানবাহনে ছিলেন। তিনি বলেন- পথিমধ্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একস্থানে অবতরণ করে প্রস্রাব করেন এবং সাধারণভাবে ওযূর কার্য সমাধা করেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম "নামায" । জবাবে তিনি বললেন- নামায তোমার অগ্রবর্তী স্থানে। অত:পর তিনি যানবাহনে আরোহন করে মুযদালিফায় এসে অবতরণ করেন। সেখানে তিনি অতি উত্তমভাবে ওযু করেন। এরপর নমাযের ইকামাত দেয়া হলে মাগরিবের নামায আদায় করেন। সেখানে সকলে নিজ নিজ উট স্বীয় স্থানে বসান। অত:পর ঈশার নমাযের ইকামাত দেয়া হলে ঈশার নামায আদায় করেন। আর উভয় নমাযের মাঝে অন্য নামায পড়েননি।

সহীহ মুসলিমে জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুযদালিফাতে মাগরিব ও ঈশার নামায এক আযানে এবং দুই ইকামাতে আদায় করেন।

উক্ত হাদীসদ্বয় থেকে জানা যায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরাফাতে যোহর ও আসর একত্রে আদায় করেন। এটা ছিল তাঁর "জমা তাকদীম" অর্থাৎ যোহরের ওয়াক্তে আসরের নামাযটাও পড়ে নেয়া। আর মাগরিব ও ঈশা একত্রে পড়াটা ছিল "জমা তা'খীর"| (অর্থাৎ মাগরিবের নামায দেরী কের ঈশার নামাযের একটু অগ্রভাগে পড়ে নেয়া)।

এ দু' নামায একত্রে পড়া সম্পর্কে আলেমদের মাঝে মতানৈক্য থাকায় আমরা ভিন্ন ভিন্নভাবে আলোচনা করছি। বলা হয় যে, এটা ছিল সফরে। এতে চিন্তা ও আলোচনার প্রয়োজন আছে, কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরাফার পূর্বে মিনাতে একত্রে পড়েন নি অনুরূপভাবে আরাফা থেকে ফিরে মিনায় আসার পরও একত্রে দু নামায পড়েন নি| আরো বলা হয় যে, এটা ছিল হজের কারণে| এতেও আলোচনার ও চিন্তার বিষয় আছে। কেননা, যদি তাই হয়, তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইহরাম বাঁধার সময় থেকেই দু'নামায একত্রে পড়তেন। (সুতরাং তিনি যেহেতু তা করেন নি, তাই এটা বলা যাবে না যে, তিনি হজের কারণেই জমা করেছেন।)

আর এটাও বলা হয় যে, এটা ছিল মাসলাহাত বা স্বার্থ ও প্রয়োজনের তাগিদে। এটাই অধিক গ্রহণযোগ্য মত। কারণ, আরাফাতে অধিক সময় অবস্থান করা এবং দু'আর জন্য নামায একত্রে আদায় করেছেন। কেননা, মানুষ সেখানে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে। সকলকে নামাযের জন্য একত্রিত হতে হলে তা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আর যদি একাকি নামায পড়ে, তবে জামায়াতে পড়ার একটা বড় রকমের মহত্ব ছুটে যায়। অনুরূপভাবে মুযদালিফাতে দু'নামায একত্রে আদায় করা অতি জরুরী। কেননা, মানুষ সূর্যাস্তের পর আরাফাত থেকে রওয়ানা হয়। আর যদি মাগরিবের নামায পড়ার জন্য বাধা দেয়া হয়, তাহলে মানুষ বিনয় ও নম্রতা ছাড়াই নামায আদায় করবে। আর যদি রাস্তায় নামায পড়ে তাহলে এটা সুকঠিন হবে। অতএব মাগরিবের নামাযকে ঈশার নামাযের সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা প্রয়োজন।

এভাবে সঠিক সময়ে নামাযকে একত্রিত করার উদ্দেশ্য হলো, নামাযের মধ্যে আল্লাহ্‌ভীতি ও বিনয় প্রকাশের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং বান্দার সুবিধার দিক লক্ষ্য রেখে এ পথ অবলম্বন করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাময়, দয়াময়ের পবিত্রতা বর্ণনা করে আমরা তাঁর দরবারে আবেদন জানাই, তিনি যেন আমাদেরকে স্বীয় হিকমত ও রহমত দান করেন। যেহেতু তিনিই একমাত্র দানকারী। সকল প্রশংসা

মহান আল্লাহর জন্য যিনি সারা জাহানের মালিক, যার অনুগ্রহে এ সৎ কাজটি সম্পন্ন হলো।

অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর, যিনি সৃষ্টি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর বংশধর, সাহাবী, তাবেয়ী যারা সৎ কর্মের অনুসরণে সময় ব্যয় করেছেন তাদের উপরও দরূদ ও সালাম।